শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

সিদীপ

রূপকল্প

দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়া

লক্ষ্য

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং নিরক্ষর ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা

শিক্ষিকা সমাবেশ ২০১৩

৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩
ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)
১৬০/এ কাকরাইল ভিআইপি সড়ক, ঢাকা-১০০০

সকাল ১১টা : স্বাগত বক্তব্য

সকাল ১১.০৫ মি. : শিক্ষিকাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা

দুপুর ১২টা : বিশেষ অতিথিবৃন্দের বক্তব্য

জনাব মাহবুব জামিল
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা

অধ্যাপক আহমেদ কামাল
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব মাহেরা খাতুন
প্রাক্তন ইউনিসেফ কর্মকর্তা

জনাব মোঃ ফজলুল কাদের
ডিএমডি, পিকেএসএফ

ড. আব্বাস ভূঁইয়া
ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, আইসিডিডিআরবি

ড. এএমআর চৌধুরী
ভাইস চেয়ারম্যান, ব্র্যাক

জনাব খিলখিল কাজী

দুপুর ১.১০ মি. : প্রধান অতিথির বক্তব্য

জনাব মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

দুপুর ১.২০ মি. : সভাপতির বক্তব্য

মোহাম্মদ আবদুল্যাহ্
সভাপতি, সিদীপ

কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত শিক্ষিকা সমাবেশ ২০১২

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

দরিদ্র, নিরক্ষর ও অসচেতন পরিবারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে না পড়া, স্কুলের প্রতিদিনের পড়া তৈরিতে সহায়তা করা এবং শিক্ষা জীবনের শুরুতেই সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার ভিত মজবুত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ১ম, ২য় ও শিশু শ্রেণির ২৫ থেকে ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে 'সিদীপ শিক্ষা কেন্দ্র' পরিচালনা করা হয়। স্থানীয় এসএসসি পাশ একজন গৃহবধূ অথবা

কলেজ-পড়ুয়া ছাত্রী শিক্ষিকা হিসাবে শিক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণত ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে শিক্ষাকেন্দ্রগুলো চলে।

একজন ফিল্ড অফিসার (শিক্ষা) ২৫টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করেন। আমাদের অধিকাংশ ফিল্ড অফিসার মহিলা এবং স্থানীয়। যিনি মাসে কমপক্ষে একবার শিক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষিকাকে ফলপ্রসূ পাঠদানের কৌশল শিখাতে সহযোগিতা করে থাকেন। প্রতি মাসেই প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিক্ষাকেন্দ্রের ভাল-মন্দ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বর্তমানে ১৬৩১টি গ্রামে ২৬০০টি শিক্ষাকেন্দ্র চলছে যার মাধ্যমে ৭৫,০০০ জন ছেলে-মেয়ে পাঠদান পাচ্ছে।

সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি গ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগণের মধ্যে বেশ প্রশংসা অর্জন করেছে এবং এর প্রয়োজনীয়তা বেশি করে বোঝা যাচ্ছে। তারই ফলশ্রুতিতে সিদীপ ২০১২ সালে নিবিড় শিক্ষা কর্মসূচি

নামে একটি কর্মসূচি শুরু করেছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো একটি ইউনিয়নের সকল গ্রামের সকল দরিদ্র পরিবারের ১ম, ২য় ও শিশু শ্রেণির ছেলে-মেয়েদের সিদীপ শিক্ষাকেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত করা। বর্তমানে ১১টি শাখা অফিসের মাধ্যমে ৩৭৫টি শিক্ষাকেন্দ্রে এর বাস্তবায়ন হচ্ছে।

সিদীপ শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির সফলতা দেখে পিকেএসএফ তার ৩৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে একইরূপ শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এবং তারা ২০০০-এর অধিক কেন্দ্র শুরু করেছে। 'আশা' আমাদের সাথে ব্যাপক আলোচনা ও মাঠ পরিদর্শনের পর একই ধরনের কার্যক্রম শুরু করেছে এবং প্রায় ১৮০০ শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছে।

আমাদের সমাজে নানা ধরনের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বা প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে এবং আমাদের বেশ কিছু শিক্ষাকেন্দ্রে তাদেরকে পড়ানো হয়। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পড়ানোর উপরে আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং এ ব্যাপারে শিক্ষিকাদেরকে উৎসাহিত করি। ●

স্কুল-ঝরে পড়া রোধে সামাজিক আন্দোলন

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

কেউ পড়তে, লিখতে বা প্রাথমিক হিসাব করতে না পারা অথবা নিজের কথা সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে না পারা একটি অবিচার ও মৌলিক স্বাধীনতার লংঘন। যদিও বাংলাদেশের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা লাভের অধিকার রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করে, বাংলাদেশে অর্ধেকের বেশি মানুষ এই অবিচারের শিকার। বিপুল সংখ্যক মানুষ এমন বন্দী অবস্থায় থাকলে গণতন্ত্র ও নির্মল রাজনীতি বিকাশ লাভ করতে পারে না। উন্নয়ন কার্যক্রমেও গতি আসে না। একটি দেশ অশিক্ষিত, অদক্ষ জনবল নিয়ে শুধুমাত্র নিম্ন প্রযুক্তির আবর্তে কম আয়ের দেশের সারিতে পড়ে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি প্রমাণিত সত্য।

এখন থেকে একশত বছরেরও আগে জাপানের একশত ভাগ লোক পূর্ণ সাক্ষর হয়ে উঠে। এটি ছিল একটি সামাজিক আন্দোলনের ফসল। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মাত্র চল্লিশ বছরে দেশটির কোন পরিবারেই কোন অক্ষরবঞ্চিত লোক না রাখার এ আন্দোলনটি সফল হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ দেশটির নাই বললেই চলে। শিক্ষিত জনবলই জাপানের উন্নতির মূল শক্তি। উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশেরও সার্বজনিন শিক্ষা এবং উন্নত জনবলের কোন বিকল্প নেই। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবন উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষা ও উন্নতির মধ্যে যে ওতপ্রোত সম্পর্ক বিজ্ঞজনেরা সে কথা বহুদিন ধরেই বলে আসছেন। বিজ্ঞজনেরা যাই বলুন, রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা যদি তাতে কর্ণপাত না করেন, তবে তেমন লাভ নেই। আবার রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা সঠিক নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণে ব্যর্থ

সম্পর্কে বলেন, বাংলাদেশের মেয়েরা শিক্ষায় ভারতের মেয়েদের চেয়ে এগিয়ে। কিন্তু এই এগিয়ে থাকাটুকু যথেষ্ট নয়। বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া কমানো গেলে আমরা আরো এগিয়ে যেতাম। সেজন্য ঝরে পড়া রোধে আমাদের বড় উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন জন ঝরে পড়া রোধে বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নিচ্ছেনও।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শুরু

২০০৫ সালে আমি সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কাজে একটা গ্রামে যাই। দেখি ওখানে একটা প্রাথমিক স্কুলের পেছনে কিছুটা খোলা জায়গায় দশ-বারোটা বাচ্চা চুপচাপ খেলছে। আমি এগুতেই তারা পালাতে চাইল। ডেকে-ডুকে কথা বললাম। বুঝলাম, স্কুলপালানো ছেলে-পেলে। সকলেই গরিব ঘরের, বুঝা যায়। স্কুলে না থাকার কারণ জানতে চাইলাম। বলল, পড়া শিখে আসেনি, অংক করেনি, হাতের লেখা আনেনি। তাই স্যার মারবে। কারণ বুঝলাম আর ভাবলাম, ক্লাস থেকে নয় বরং অল্পদিনেই স্কুল থেকেই ঝরে পড়বে ওরা। 'পড়া শেখনি কেন?' জিজ্ঞেস করলাম। কেউ কেউ বলল, বাসায় কে পড়াবে। বুঝলাম, মা-বাবারা নিরক্ষর, খেটে খাওয়া মানুষ। মনে পড়ল আমার ছোট বেলায় মা আমাকে হাতে ধরে লেখাতেন। অক্ষরের উপর হাত দিয়ে অক্ষর ও উচ্চারণ শেখাতেন। এই বাচ্চাগুলোর কে আছে?

আমাদের দেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনে কোন শিশু স্কুলে আসা বাদ দিলে তার

বাচ্চাদের পরের দিনের স্কুলের পড়া শিখিয়ে দিতে পারবেন? সহকর্মীরা বলল, পাওয়া যাবে। সেদিনই গ্রামের পাঁচটি মেয়ে অফিসে আসল। সমস্যাটা তাদের বুঝিয়ে দেয়া হল। আপনারা একটা জায়গা ঠিক করবেন, ১০-১৫টা এ ধরনের বাচ্চা চিহ্নিত করবেন, বিকালে ৩টা থেকে ৫টা এই দুই ঘণ্টা পড়া দেখিয়ে দেবেন। তারা উৎসাহের সাথে বললেন, কাজটি পারবেন। বললাম, আপনাকে ৫০০ টাকার একটি ছোট্ট সম্মানী দেয়া হবে। পরের মাস থেকে ৫ জনই শুরু করলেন ৫টি কেন্দ্র।

তারা পারলেন এবং খুব ভালভাবেই পারলেন। এদিকে ওদিকে সাড়া পড়ল। আরো অনেকেই কাজটা করতে চাইল। আমরা এই কর্মসূচিকে বললাম, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)। প্রাইমারী স্কুলকে সাহায্য করা, কোন সমান্তরাল কর্মসূচি নয়। ঝরে পড়া ঠেকানো। স্কুলের ছাত্ররা ক্লাসে থাকবে। পড়াশুনার এবং শাস্তির ভয় কেটে যাবে ।

অবাক করা কাণ্ড ঘটল। শিশুদের মধ্যে আমাদের কেন্দ্রে আসার আগ্রহ প্রচুর। কেউ বাদ যায় না, প্রতিযোগিতা করে আগে আসে। শিক্ষিকাদের উৎসাহও অনেক। অভিভাবকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বাচ্চারা পড়া শিখছে, ঘরের কাছে থাকছে। বাড়তে থাকল কর্মসূচিটি। প্রতিবছরই কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়তে থাকল। আমাদের অনুমানকে ভেঙ্গে দিয়ে ২০১৩ সালে এখন ২,৬০০ কেন্দ্রে প্রায় ৭৫,০০০ শিশু পাঠ নিচ্ছে। ২,৬০০ গ্রামীণ মহিলা কেন্দ্রগুলো চালান সংগঠক এবং শিক্ষিকা হিসাবে।

কেউ কেন্দ্রগুলোকে বলছেন উঠান-স্কুল। বাচ্চারা বিকেলে এই কেন্দ্রে কিচির-মিচির করে।

বাচ্চারা খোলামেলা এই কেন্দ্রগুলোতে আসতে পছন্দ করে। সময়ের আগেই এসে হাজির হয়। মায়েরা নিশ্চিন্ত থাকে। বাচ্চারা বইয়ের পড়া পড়ে, গান করে, কবিতা বলে, কোরাস করে, অংক শেখে। অভিভাবকরা এই স্কুলের বিষয়ে খুবই আগ্রহী। প্রতিমাসে একবার করে অভিভাবক-সভা হয়। নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। সমস্যার সমাধান হয়। শিক্ষিকা অনুপ্রেরণা পায় অভিভাবকদের কাছ থেকে। অভিভাবকদের সিদীপ-এর কাছে একটিই আবদার, 'ঘরে পড়াতে পারি না, এখানে আমাদের বাচ্চারা শেখে। আপনারা কেন্দ্রটি বন্ধ করবেন না, প্লিজ।'

শিশুরা যেমন আনন্দ করে কেন্দ্রগুলোতে, তেমনি স্কুলের পড়া দিতে এখন সহজ হয়। স্কুলে যেতে ভয় নেই এখন। পরীক্ষায় ফল হয় আগের চেয়ে ভাল। অনেকেই এখন ক্লাসে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়ও হচ্ছে। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও খুশি। তাদের ছাত্র-ছাত্রীরা তৈরি হয়ে আসছে। ঝরে পড়ছে না।

এখন দুই হাজার ছয়শত মেয়ে এই কাজটি করছে। কিন্তু এরা কারা? এরা গ্রামেরই মেয়ে। কেউ হয়তো অষ্টম শ্রেণি পেরিয়েছে, অধিকাংশই এসএসসি, এইচএসসি পাস, কেউ কেউ আবার স্নাতক করেছে। গ্রামের মধ্যে যে আগ্রহী, সংগঠিত করার যোগ্যতা রাখেন এমন এবং গ্রামেই একটি স্থান নির্বাচন করে ২০-২৫টি বাচ্চাকে নিয়ে শুরু করতে পারে, সেই

হয়ে উঠে শিক্ষিকা। ঘরের একটি মেয়ে যার বাবা হয়তো রিক্সা চালায় বা ছোট কৃষক। গ্রামের উঠতি ছেলেদের দ্বারা 'টিজিং'-এর শিকার বা মায়ের বকুনি খাওয়া 'আইবুড়ো' মেয়ে। সেই হঠাৎ 'শিক্ষিকা' হয়ে ওঠে, 'আপা' হিসাবে লোকের স্বীকৃতি পায়। এই সম্মান তাঁকে ভিন্ন মানুষ হিসেবে, একজন দায়িত্ববান সমাজসেবী হিসাবে গড়ে তোলে। পাল্টে যায় তার জীবন। মা-বাবার উদ্বেগ কাটিয়ে বিয়ের প্রস্তাব আসে, বিয়ে হয়। শিক্ষিকার কাছে বাচ্চাগুলো নিয়ে কেন্দ্রটি হয়ে উঠে এক স্বপ্ন।

আমরা সবসময়ে বলে এসেছি এটি একটি সহজ কাজ, যে কেউ শুরু করতে পারেন। এর জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই, বড় অর্থের প্রয়োজন নেই এবং সকল মানুষ একে স্বাগত জানায়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সর্বপ্রথম কাজটি দেখে এর ব্যাপক প্রসারের আয়োজন করে। তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে এর সম্পর্কে জানায় এবং ৩৫টি সংস্থার ৭০ জন কর্মকর্তাকে আমাদের কাজের এলাকায় পাঠায়। তারা কাজটি দেখে, তার থেকে ধারণা গ্রহণ করে নিজেরা নিজেদের এলাকায় একই কাজ শুরু করে। ২০১৩-তে এখন সংস্থাগুলো প্রায় দুই হাজার কেন্দ্রও স্থাপন করেছে। সারাদেশে কাজ করে এমন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'আশা' আমাদের কাছ থেকে কর্মসূচিটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চায় এবং একটি প্রতিনিধি দল পাঠান আমাদের কর্ম এলাকায়। দু বছর আগে খুব অল্প সময়ের মধ্যে (মাত্র তিন মাস) তারা কর্মসূচিটি শুরু করেন। ২০১৩-তে ১,৮০০ কেন্দ্র তৈরি করেন। 'আশা'র যে নেটওয়ার্ক রয়েছে

তাতে তারা সারাদেশে কর্মসূচিটি চালু করার সক্ষমতা রাখেন। আমার হিসাবে দুই লক্ষেরও বেশি মেয়ের স্থানীয় কর্মসংস্থান করতে পারে এই কর্মসূচিটি। এর ফলে সার্বজনিন শিক্ষাকে দ্রুততর করা সম্ভব, স্কুল থেকে ঝরে পড়া রুখে দেওয়া সম্ভব এবং জাতিকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করা সম্ভব।

প্রথম প্রজন্মের শিশুদের স্কুলে রাখতে হলে এ ধরনের সহায়তা প্রয়োজন। এর সাথে মিল আছে শিক্ষিত মায়ের সন্ধ্যেবেলা তার সন্তানকে নিয়ে পড়াতে বসার, কিন্তু কোন সংঘাত নেই আমাদের চলমান শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে। এটি একটি সহায়ক কর্মসূচি। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিকে শক্তিশালী করণের কর্মসূচি। দরিদ্র নিরক্ষর পিতা-মাতার সন্তানদের জন্য ফার্স্ট জেনারেশন এডুকেশন কর্মসূচি। এটি একটি সামাজিক আন্দোলন। চলুন আমরা একে এগিয়ে নিয়ে যাই।

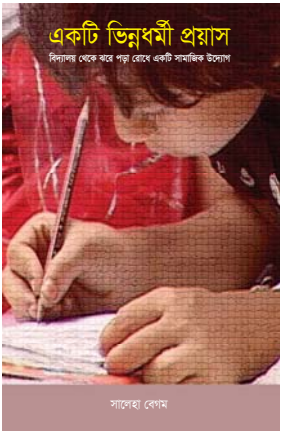

একটি ভিন্নধর্মী প্রয়াস

বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধে একটি সামাজিক উদ্যোগ

রচনা: সালেহা বেগম
প্রকাশকাল: অগাস্ট ২০১৩

গবেষক সালেহা বেগম অনেক অভিভাবক, শিক্ষা সহায়িকা, এলাকাবাসী প্রমুখের সঙ্গে কথা বলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির অবদানের কথা এই বইতে তুলে ধরেছেন। তাঁর গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, সিদীপ শিক্ষাকেন্দ্র ঝরে পড়া রোধে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। সংস্থার শিক্ষিকাদের জীবন-সংগ্রাম ও সমাজজীবনে সম্মান বৃদ্ধির উৎসাহব্যঞ্জক চিত্র এসেছে। দেখা যায় অনেক শিক্ষিকাই এখনো পড়াশোনা করছেন এবং শিক্ষাকেন্দ্র থেকে আয় তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সহায়তা করছে। এছাড়াও দেখা যায় এই কর্মসুচি মেয়েদেরকে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিতে উৎসাহিত ও কিছুটা সক্ষম করেছে।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
সিদীপ ভবন • বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসি কালচার হাউজীং সোসাইটি লি. শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৪১৮৯১, ৯১৪১৮৯৩, Email : cdipbd@yahoo.com, web: www.cdipbd.com